চীন: পরাশক্তির বিবর্তন

আনু মুহাম্মদ

চীন কি সমাজতান্ত্রিক না পুঁজিবাদী না নতুন এক ব্যবস্থার দেশ? এই প্রশ্ন নিয়ে বিশ্বব্যাপী বিতর্ক থাকলেও এব্যাপারে সবাই একমত যে, বর্তমান বিশ্বে চীন এক পরাশক্তি। প্রচলিত জিডিপি বিচারে যুক্তরাষ্ট্রের পরই দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। আর ক্রয়ক্ষমতার সমতার নিরিখে (পিপিপি) বিচার করে চীন এখন বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি। পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতিতে চীনের প্রভাব ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। এর পাশাপাশি চীন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্লেষণেও অভিহিত হচ্ছে। চীনের এই দ্রুত বিস্ময়কর অর্থনৈতিক গতির রহস্য কী? দেশের ভেতর বৈষম্য, দুর্নীতি বৃদ্ধি, বিশাল ধনিক গোষ্ঠীর প্রবল আধিপত্য ইত্যাদির সাথে কমিউনিস্ট পার্টির একক শাসন কীভাবে সঙ্গতিপূর্ণ? কথিত বাজার সমাজতন্ত্রেরই বা স্বরূপ কী? বিশ্বের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য এর তাৎপর্য কী? এসব প্রশ্ন অনুসন্ধান করতেই এই লেখার পরিকল্পনা। কয়েক পর্বে এটি প্রকাশিত হবে।

'It is better that China remains asleep, for the world is sure to tremble when she awakes.' Nepoleon Bonaparte

জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্র চীন, পুরো নাম ইংরেজিতে 'পিপলস রিপাবলিক অব চায়না' বাংলায় বলা হয় 'গণপ্রজাতন্ত্রী চীন'। এখন এইদেশের জনসংখ্যা ১৩৭ কোটি। এর আয়তন ৯৬ লাখ বর্গ কিলোমিটার। ভূমির আয়তনের দিক থেকে এটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম, সমগ্র অঞ্চল ধরলে তা পরিমাপের পার্থক্য অনুযায়ী তৃতীয় বা চতুর্থ হবে। ২২টি প্রদেশ, ৫টি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, ৪টি কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত পৌরসভা (বেইজিং, তিয়ানজিন, সাংহাই, চংকিং) এবং ২টি বিশেষ মর্যাদায় ভিন্নভাবে পরিচালিত অঞ্চল (হংকং, ম্যাকাও) নিয়ে বর্তমান চীন। তাইওয়ান, যে রাষ্ট্র এখনও চীন হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেয়, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন তার দাবীদার প্রথম থেকেই। ১৯৪৯ সালে বিপ্লবের পর চীন থেকে পালিয়ে চিয়াং কাই শেক এই রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন, যার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এখনও আছে।

ভূপ্রকৃতির দিক থেকে চীন বৈচিত্র্যপূর্ণ। সমতল, পাহাড়, বনভূমি, মরুভূমি সবই আছে এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। মোট আয়তনের খুব কম অংশই আবাদযোগ্য। হিমালয়, কারাকোরাম, পামির এবং তিয়ান শান পর্বতমালা চীনকে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া থেকে ভিন্ন করে রেখেছে। তিব্বত থেকে বিশ্বের তৃতীয় দীর্ঘতম নদী ইয়াংসী এবং ষষ্ঠ দীর্ঘতম নদী হোয়াং হো বা হলুদ নদী চীনের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরে চীনের উপকূলীয় দৈর্ঘ্য ১৪ হাজার ৫০০ কিলোমিটার বা ৯ হাজার মাইল দীর্ঘ। চীনের সাথে অনেকগুলো দেশের সীমান্ত। এই দেশগুলো হলো: ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, নেপাল, ভূটান, মিয়ানমার, মঙ্গোলিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিজিস্তান, তাজিকিস্তান, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস ও রাশিয়া। ভারতের সাথে চীনের সীমান্ত বিরোধ কয়েক দশকের। এনিয়ে ১৯৬২ সালে দুইদেশের মধ্যে যুদ্ধও সংঘটিত হয়।

ইরান, ভারত এবং 'আমেরিকা'র ইনকা মায়ার মতো কিংবা তার চাইতেও প্রাচীন চীনের সভ্যতা। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার অঞ্চলের মতো চীনকে ঘিরে, প্রাচীন রাজ্য, শাসন ও ক্ষমতা নিয়ে অনেক মিথ আছে। লিখিত ইতিহাস অবশ্য অনেক পরের। সেই সময় থেকেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিবেচনায় চীন বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি। অষ্টাদশ শতক থেকে ইউরোপে যে শিল্প বিপ্লব শুরু হয়, তার ধারাবাহিকতায় উনিশ শতকে সারাবিশ্বে সাম্রাজ্যিক আধিপত্যে ইউরোপ হয়ে দাঁড়ায় প্রধান ঔপনিবেশিক শক্তি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায় চীন সেসময় পিছিয়ে যায় এবং ইউরোপের পূর্ণ উপনিবেশে পরিণত না হলেও তার প্রভাব বলয়ে পতিত হয়। এইসময়ে জাপানও সাম্রাজ্যিক ক্ষমতায় ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। চীনের বিরাট অংশ জাপানের ঔপনিবেশিক নিষ্ঠুর শাসনের অধীনস্ত হয়।

ইউরোপ ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য, বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্ত প্রভুদের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের লড়াইকে সংগঠিত ও সমন্বিত করেই চীন কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘ জনযুদ্ধ পরিচালনা করে। ১৯৪৯ সালের বিপ্লব চীনকে আবারও বিশ্বের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে হাজির করে। এই বিপ্লবের পরও অনেক উঠানামা গেছে। বর্তমান চীন অনেকরকম সংস্কারের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে।

এই চীন কি সমাজতান্ত্রিক না পুঁজিবাদী না নতুন এক ব্যবস্থার জন্ম দিচ্ছে? এই প্রশ্ন বিশ্বব্যাপী বিদ্যায়তন, রাজনীতি ও অর্থনীতি আলোচনায় এখন এক অব্যাহত বিতর্কের বিষয়। তবে সবাই একমত যে, বর্তমান বিশ্বে চীন এক পরাশক্তি। প্রচলিত জিডিপি বিচারে যুক্তরাষ্ট্রের পরই দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। আর ক্রয়ক্ষমতার সমতার নিরিখে বিচার করে আইএমএফ এর হিসাব অনুযায়ী চীন এখন বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি। পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতিতে চীনের প্রভাব ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। এর পাশাপাশি চীন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্লেষণেও অভিহিত হচ্ছে, বিশেষত, আফ্রিকায় তার ভূমিকার কারণে।

চীনের এই দ্রুত বিস্ময়কর অর্থনৈতিক গতির রহস্য কী? দেশের ভেতর বৈষম্য, দুর্নীতি বৃদ্ধির খবর নিয়মিত। বিশাল ধনিক একটি গোষ্ঠী প্রবল প্রতাপে নিয়ন্ত্রণ করছে অর্থনীতির কিছু তৎপরতা। এসবের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির একক শাসন কীভাবে সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে? চীন সরকারের দাবি অনুযায়ী, তারা বাজার সমাজতন্ত্রের পথে চলছে। এর আসলে স্বরূপ কেমন?

এসব প্রশ্ন অনুসন্ধান করতেই এই লেখার পরিকল্পনা। বিশ্ব পুঁজিবাদের গতিমুখ বুঝতে চীনের গতি প্রকৃতি বিশ্লেষণ জরুরি। যথাযথভাবে চীনের শক্তি ও দুর্বলতা, সাফল্য ও ব্যর্থতা, পরিবর্তন ও ধারাবাহিকতা বুঝতে গেলে একদিকে ঐতিহাসিক অন্যদিকে বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিত আনতে হবে। বিপ্লব পূর্ব চীন, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং ৭০ দশক থেকে তার সংস্কারের ভেতর বাহির পরীক্ষা করতে হবে।

সাম্রাজ্যের উঠানামা

মানুষের প্রাচীন সভ্যতা ও আদি অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান যতোই অগ্রসর হচ্ছে ততোই নতুন নতুন তথ্য আমাদের সমৃদ্ধ করছে।

কোথাও এসে বলা যায় না, এটাই শেষ। এই জানা এক অব্যাহত প্রক্রিয়া। এযাবতকালে এই অনুসন্ধানে চীনে আদিকালের মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে প্রাপ্ত চিহ্ন থেকে ধারণা করা হয় যে, এখানে আড়াই লাখ থেকে ২৫ লাখ আগের মানবপ্রজাতির কোন না কোন ধরনের অস্তিত্ব ছিলো। 'পিকিং মানব' হিসেবে পরিচিত মানুষের ফসিল বেইজিং এর কাছাকাছিই পাওয়া গিয়েছিলো যাদের জীবিত অস্তিত্ব ৭ থেকে ৯ লাখ বছর আগের বলে বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন।

অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, খ্রীষ্টপূর্ব ৩ হাজার সালেও চীনে কোনো না কোনো ধরনের লিখিত রূপ পাওয়া যায়। তবে অন্য ভাষার মতো চীনা বা ম্যান্ডারিন ভাষায় বর্ণমালা নেই। এখানে ব্যবহৃত হয় ছবি ও প্রতীক। এই ধারার আর পরিবর্তন হয়নি। চীনে প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, খ্রীষ্টপূর্ব ২ হাজার বছর আগেই চীনে সাম্রাজ্যিক বংশানুক্রমিক শাসনের উদ্ভব। তবে অনুসন্ধান ও প্রাপ্ত প্রমাণাদি অনুযায়ী, বংশানুক্রমিক শাসন বা কেন্দ্রীভূত শাসন স্থায়ীত্ব পেয়েছে বিভিন্ন খন্ড খন্ড শাসন ও সমাজের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে। হোয়াং হো বা হলুদ নদীর তীরেই প্রথম কৃষি ও জনবসতির লক্ষণ দেখা যায়।

খ্রীষ্টপূর্ব দেড় হাজার বছর আগে শাং সাম্রাজ্যের তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। তাদের সময়ে লিপির সন্ধান পাওয়া যায়, তা বর্তমান ভাষিক গঠনের পূর্বসূরী। শাং সাম্রাজ্যের পর ঝও শাসন। এই সময়কালের কেন্দ্রীয় শাসন কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বেশ কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। কিন্তু কালক্রমে কিন রাজ্যের কাছে বাকিগুলো পরাজিত হওয়ায় প্রথম কেন্দ্রীভূত চীনা রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এইসময়ে কিন শি হুয়াং নিজেকে প্রথম সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করেন। ভাষা, মুদ্রা, পরিমাপ একক বিষয়ে মান নির্ধারণ হয় এই সময়ে।

খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ সালের দিকে শুরু হয় হান রাজবংশীয় সাম্রাজ্য কাল। হান জাতীয় পরিচয় এই সময়ই সংগঠিত হয়। এই সময়কালে চীন সাম্রাজ্যের সীমা আরও সম্প্রসারিত হয় এবং বর্তমান কোরিয়া, ভিয়েতনাম, মঙ্গোলিয়া এবং মধ্য এশিয়া এর শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়। সিল্ক রোডের জন্মও এই সময়েই। হান সম্রাট রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ হিসেবে কনফুসিয়ান মতবাদ গ্রহণ করে। পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি হিসেবে স্বীকৃত গ্রেট ওয়াল তৈরি হয়েছে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের সময়ে ধারাবাহিকভাবে। প্রায় দুই হাজার বছরে বর্তমান চেহারা লাভ করেছে এটি। শাখাপ্রশাখা সহ প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ এই দেয়াল এখনও বিস্ময়। কিন্তু অনেকেরই এর নির্মাণকাজের নিষ্ঠুর দিক জানা নেই। এই দেয়ালের নীচে অসংখ্য দাস শ্রমিকের লাশ আছে বলে অনেক গবেষক মনে করেন, কিন্তু তার হিসাব করা কঠিন।

হান সাম্রাজ্যের পতনের পর কয়েকশো বছর চীনের শাসনব্যবস্থা খুবই অস্থিতিশীল ছিলো। এরপর তাং এবং সং সাম্রাজ্যের সময়ে চীনা প্রযুক্তি ও শিল্প সংস্কৃতির অভূতপূর্ব বিকাশ দেখা যায়। তাং সাম্রাজ্যের কালে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। সং সাম্রাজ্যের সময়েই বিশ্বের প্রথম কাগজ মুদ্রার প্রচলন হয়। এবং এই সময়েই স্থায়ী বিশাল নৌবাহিনী গঠিত হয়। সপ্তম শতকের চীন থেকেই হিউয়েন সাং ভারত সফরে আসেন এখানকার বৌদ্ধ মঠ বা শিক্ষালয়ে শিক্ষা ও গবেষণা সন্ধানে। দশম ও একাদশ শতকে চীনের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ১০ কোটি। ত্রয়োদশ শতকে চীন ক্রমে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের অধীনস্ত হয়। ১২৭১ সালে মোঙ্গল অধিপতি কুবলাই খান ইউয়ান রাজত্ব পত্তন করেন। সং সাম্রাজ্যের শেষ দিকে চীনের জনসংখ্যা ছিলো ১২ কোটি। এই রাজত্ব পরাজিত করে মিং রাজত্বের সূচনা হয় ১৩৬৮ সালে। এই রাজত্বেও শিল্প সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখার চর্চা অনেক সম্প্রসারিত হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে চীনের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই সময়ই চীনের রাজধানী হিসেবে পিকিং বা বেইজিং এর প্রতিষ্ঠা ঘটে।

সপ্তদশ শতকে অনেকগুলো বিদ্রোহ দেখা যায়। ১৬৪৪ সালে এক বিদ্রোহে রাজধানীর পতন ঘটলে শেষ মিং সম্রাট আত্মহত্যা করেন। বিদ্রোহীদের স্বল্পস্থায়ী শাসন উচ্ছেদ করে পত্তন হয় কিং রাজত্বের। রাজধানী হিসেবে পিকিং বা বেইজিং স্থায়ীত্ব লাভ করে। এই রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়, টিকে থাকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত। এটাই চীনের শেষ সাম্রাজ্যিক রাজত্ব। উনিশ শতক থেকে এই শাসকদেরও মোকাবিলা করতে হয় পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকে। বৃটেন, ফ্রান্স ছাড়াও জাপান সাম্রাজ্যবাদের একাধিক আগ্রাসন ও তাদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এই শতকে। এছাড়া এই শতকে অনেকগুলো বিদ্রোহের ঘটনাও ঘটে। এই ঘটনাগুলো চীনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুতরাং উনিশ শতকের চীন নিয়ে আমাদের একটু বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

> ইরান, ভারত এবং 'আমেরিকা'র ইনকা মায়ার মতো কিংবা তার চাইতেও প্রাচীন চীনের সভ্যতা। অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার অঞ্চলের মতো চীনকে ঘিরে, প্রাচীন রাজ্য, শাসন ও ক্ষমতা নিয়ে অনেক মিথ আছে। লিখিত ইতিহাস অবশ্য অনেক পরের। সেই সময় থেকেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিবেচনায় চীন বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি।

উনিশ শতকের চীন: আফিম যুদ্ধ

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ১৭৭৬ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয় এডাম স্মীথের গ্রন্থ 'এন ইনকোয়ারি ইনটু দ্য নেচার এন্ড কজেস অব দ্য ওয়েলথ অব নেশনস'। এইসময় ইংল্যান্ডসহ ইউরোপে শুরু হয়েছে শিল্পবিপ্লব, ক্রমেই তা শক্ত ভিত্তি তৈরি করে বিস্তৃত হচ্ছে। এই শিল্পবিপ্লব সম্পর্কিত ছিলো বিশ্বজুড়ে উপনিবেশগুলোতে ইউরোপীয় দেশগুলোর দখল, শাসন ও সম্পদ সঞ্চয়নের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। গ্রন্থটি বস্তুত পুঁজিবাদের সূচনাকালের ঘোষণা ও তার জটিল জগত অনুসন্ধান। সেকারণে এই গ্রন্থে ইউরোপের ভেতর ও বাইরের অনেক বিষয় দেখার চেষ্টা আছে, আবার অনেককিছু নেইও। ১৮৬৭ সালে ও পরে প্রকাশিত মার্কসের কয়েক খন্ড গ্রন্থ পুঁজিতে স্মীথের এই গ্রন্থসহ সেসময়ের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের গভীর পর্যালোচনা আছে।

যখন ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের যাত্রা জোরদার হচ্ছে তখনও চীন প্রবল অর্থনৈতিক শক্তি। সমাজবিজ্ঞানী, জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক, জিওভানি আরিঘি তাঁর এ্যাডাম স্মীথ ইন বেইজিং গ্রন্থে চীনের এইসময়কাল পর্যালোচনা করে বলছেন, প্রকৃতপক্ষে স্মীথ যখন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ লিখছেন তখনও পূর্ব এশিয়ার পতন শুরু হয়নি। বরঞ্চ অষ্টাদশ শতকে চীনে যে শান্তি-স্থিতিশীলতা, সমৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি শক্তি তৈরি হয়েছিলো তা ইউরোপের আলোকময়তা বা এনলাইটেনমেন্ট এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যেমন লেইবনিজ, ভলতেয়ার, এবং কুইসনি বা কেনেসহ অনেকের অনুপ্রেরণার উৎস ছিলো। চীনের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, নৈতিক নির্দেশনা, মেধা ও শক্তির সমন্বয়, কৃষিপ্রধান জাতীয় অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা অধ্যয়ন করে বস্তুত ইউরোপের জন্য পথ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁদের অনুসন্ধানী চোখে চীন সাম্রাজ্যের আকার, জনসংখ্যা এবং ঐক্য ছিলো বিশেষ আগ্রহের বিষয়। চীনের আভ্যন্তরীণ বাজারের

আকারকে স্মীথ বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন, যা তাঁর ভাষায়, 'ইউরোপের সবগুলো দেশ একত্র করলেও তার তুলনায় খারাপ হবে না'।[১]

উনিশ শতকেই এই প্রবল শক্তির মধ্যে ভাঙন ধরে। ভেতরের দ্বন্দ্ব সংঘাত ও বাইরের আগ্রাসন চীনকে দীর্ঘ স্থিতিশীল সমৃদ্ধির অবস্থান থেকে সরিয়ে দেয়। এই শতকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, আফিম যুদ্ধ, দেশের ভেতরে বিদ্রোহ, দুর্ভিক্ষ, যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশে বড় আকারে অভিবাসনসহ অনেকগুলো ভবিষ্যৎ নির্ধারক ঘটনাবলী অতিক্রম করে চীন।

চীনে কিং সাম্রাজ্য শুরু হয়েছিলো ১৬৪৪ সালে, এটি চীনের শেষ সাম্রাজ্যিক শাসন। এর সমাপ্তি ঘটে ১৯১২ সালে। উনিশ শতকে এই সাম্রাজ্যের চীনকেই পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের চাপানো দুইদফা আফিম যুদ্ধের শিকার হতে হয়। বৃটিশসহ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবসায়ীদের কাছে চীনকে উন্মুক্ত করা নিয়ে বিরোধ থেকেই আফিম যুদ্ধের উৎপত্তি। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের দাবি ছিলো চীনে ব্যাপকভাবে আফিম বাজার তৈরির পথে সব বাধা নিষেধাজ্ঞা দূর করতে হবে। চীন এতে সম্মত ছিলো না। এ ব্যাপারে চাপ প্রয়োগ করতেই বৃটিশরা চীনের বিরুদ্ধে সামরিক হামলা শুরু করে। ফ্রান্সেরও ভূমিকা ছিলো এতে। বৃটেনের সাথে প্রথম চীনের আফিম যুদ্ধ চলে ১৮৩৯ সাল থেকে ১৮৪২ সাল পর্যন্ত, এরপরের যুদ্ধ ১৮৫৬ সালে শুরু হয়ে শেষ হয় ১৮৬০ সালে। প্রথম যুদ্ধে পরাজয়ের পরই চীনকে অপমানজনক শর্তে চুক্তি করতে হয়। ১৮৪২ সালে স্বাক্ষরিত নানকিং চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশদের হাতে ছেড়ে দিতে হয় হংকং। পরাজয়ের এখানেই শেষ নয়। ১৮৯৪-৯৫ সালে প্রথম চীন জাপান যুদ্ধেও চীনের পরাজয় হয়। এর ফলে তাইওয়ান চলে যায় জাপানের হাতে, কোরিয়ার ওপরও চীন তার নিয়ন্ত্রণ হারায়।

> অষ্টাদশ শতকে চীনে যে শান্তি-স্থিতিশীলতা, সমৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি শক্তি তৈরি হয়েছিলো তা ইউরোপের আলোকময়তা বা এনলাইটেনমেন্ট এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ যেমন লেইবনিজ, ভলতেয়ার, এবং কুইসনি বা কেনেসহ অনেকের অনুপ্রেরণার উৎস ছিলো। চীনের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, নৈতিক নির্দেশনা, মেধা ও শক্তির সমন্বয়, কৃষিপ্রধান জাতীয় অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা অধ্যয়ন করে বস্তুত ইউরোপের জন্য পথ অনুসন্ধান করেছেন।

এই সময়কালের বৃটিশদের আফিমসহ নৌবাণিজ্য কেন্দ্র করে অমিতাভ ঘোষ ত্রয়ী উপন্যাস লিখেছেন। এগুলো বিস্তর গবেষণা ও পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে লেখা। এই সিরিজের প্রথম উপন্যাস 'সি অব পপিজ'। এতে আছে কীভাবে বৃটিশ বণিকেরা চীনের বাজার লক্ষ করে ভারতে আফিম উৎপাদন সম্প্রসারণ করছে। এর ফলে ভারতের বহু অঞ্চল বদলে যাচ্ছে। খাদ্য উৎপাদনের জমি চলে যাচ্ছে এসব অর্থকরী ফসল উৎপাদনে। চীন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এই বণিকদের অসন্তোষ তাদের বিভিন্ন আলোচনা বিতর্কে উঠে এসেছে। বৃটিশ কর্তাব্যক্তিদের সারকথা হলো, চীনারা আফিম বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও নিষেধাজ্ঞা বজায় রেখে মুক্ত বাজার অর্থনীতি, ব্যক্তি স্বাধীনতার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। এই বাধা দূর করতে হলে প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করতেই হবে।[২]

প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশরা চীনে আফিম বিক্রি শুরু করে এর আগেই, ১৭৮১ সালে। এক্ষেত্রে একক আধিপত্য ছিলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির। ১৮২১ থেকে ১৮৩৭ সালের মধ্যে আফিম বিক্রি চারগুণ বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবসা সরল বা আইনসম্মত ছিলো না। কোম্পানি আফিমভরা জাহাজ নিয়ে হাজির হতো মূল ভূখন্ডের কাছাকাছি কোনো দ্বীপে। সেখান থেকে চীনা বণিকরা রূপার বিনিময়ে নিষিদ্ধ এই নেশাদ্রব্য সংগ্রহ করে তা মূল ভূখন্ডে সরবরাহ করতো। এই ব্যবসায় যুক্ত থেকে চীনের ভেতরেও আমলাসহ প্রভাবশালী একটি গোষ্ঠী তখন বিপুল অর্থ উপার্জন করেছে।

ইংল্যান্ডের মুক্ত বাণিজ্যের প্রবক্তাদের একাংশের চাপে ১৮৩৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসান ঘটে এবং আরও অনেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এতে যোগ দেয়। একপর্যায়ে মার্কিন ব্যবসায়ীরাও আফিম ব্যবসায়ে যুক্ত হয়। মার্কিনীরা এর যোগান বাড়াতে থাকে তুরস্ক থেকে। ব্রিটিশ ও মার্কিন ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতায় আফিমের দাম কমে যায়, তবে তার বিক্রি বাড়ে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। এই ব্যবসায়ীদের তখন প্রয়োজন এই বাণিজ্যের ওপর বিদ্যমান সব বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার। এই বিষয়ে চাপ থেকেই ক্রমে যুদ্ধ শুরু। আর এতে পরাজয়ের মধ্য দিয়ে চীনের শাসনব্যবস্থাতেও একের পর এক ফাটল আসতে থাকে। পরে আমরা দেখি এই পশ্চিমা বিশ্বেই চীনাদের পরিচয় হয় আফিমখোর হিসেবে!

যাইহোক, উনিশ শতকে শুধু বাইরের আক্রমণ নয়, চীনের ভেতরেও কিং সাম্রাজ্যের শাসকদের ক্রমবর্ধমান বিদ্রোহ মোকাবিলা করতে হয়।

উনিশ শতকের চীন: কৃষক বিদ্রোহ

অনেকগুলো কৃষক-জনবিদ্রোহ উনিশ শতকের চীনের সমাজ ও রাষ্ট্রক্ষমতার ভিতে বড় আকারের নাড়া দেয়। বেশিরভাগ বিদ্রোহ আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থতায় শেষ হলেও তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরবর্তী শতকের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে। বিভিন্ন অনুসন্ধানী বিবরণী থেকে ধারণা করা যায় যে, উনিশ শতকে চীনের অভ্যন্তরে জনবিক্ষোভ ও বিদ্রোহ যে রক্তাক্ত দমনের শিকার হয় তাতে ১০ লক্ষাধিক মানুষ নিহত হন। এর বাইরে যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ এবং বিভিন্নরকম অসুস্থতায় প্রায় ২ কোটি মানুষ নিহত হন বলে বিভিন্ন ইতিহাসবিদ দাবি করেন।

উনিশ শতকের বেশিরভাগ প্রবল বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ৫০ ও ৬০ দশকে। এর মধ্যে তাইপিং বিদ্রোহ খুবই উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ চীনে এই বিদ্রোহ শুরু হয় ১৮৫০ সালে, অব্যাহত থাকে ১৮৬৪ পর্যন্ত। বিদ্রোহের সঙ্গে যে কাহিনী প্রচলিত তাতে হং জিউ কুয়ান নামে এক ব্যক্তির কথা জানা যায় যিনি নিজেকে যীশুর ছোট ভাই হিসেবে প্রচার করতেন এবং দেশের অবিচার অত্যাচার বৈষম্যের বিরুদ্ধে যীশুর নামেই বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। অনুসন্ধানে দেখা যায়, ধর্মের আবরণ থাকলেও এটি ছিলো বস্তুত সামন্ত নির্যাতনের ভয়াবহতার বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষক জনতার অসন্তোষ থেকে সৃষ্ট বিদ্রোহ। সেজন্যই এতে মানুষের বিপুল অংশগ্রহণ সৃষ্টি হয়েছিলো। বহু বছর এই হং এর নেতৃত্বে দক্ষিণ চীনে ৩ কোটি মানুষের এলাকায় প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাজ্য

1. Giovanni Arrighi: Adam Smith in Beijing, Lineages of the Twenty-First Century, Verso, 2007
2. Amitav Ghosh: Sea of Poppies, Penguin, 2008.

টিকে ছিলো। এর রাজধানী ছিলো নানজিং।

বিদ্রোহীদের চেষ্টা ছিলো ব্যাপক সমাজ সংস্কার করা, যার মধ্যে সম্পত্তিতে সর্বজনের অধিকার, নারীর সমানাধিকার অন্তর্ভূক্ত ছিলো। তবে যেক্ষেত্রে সংস্কার করতে গিয়ে তাদের সমর্থন হ্রাস পেয়েছে সেটি হলো কনফুসিয়ান, বৌদ্ধ মতবাদ ও চীনা লোকসংস্কৃতি বর্জন করে খ্রীষ্টধর্মের বিস্তার। তারপরও সামাজিক ক্ষেত্রে জনগণের অবস্থার পরিবর্তনের কর্মসূচি থাকায় তারা বহুবছর টিকে থাকতে পেরেছে। খ্রীষ্টধর্মের বিস্তারের চেষ্টা সত্ত্বেও বিদ্রোহীরা ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন পাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। বরঞ্চ ব্রিটিশ ও ফরাসীদের সহায়তা নিয়েই কিং সম্রাট শেষপর্যন্ত বিদ্রোহ নিশ্চিহ্ন করতে সক্ষম হন। তার আগেই অবশ্য বিদ্রোহের নেতা অসুস্থতায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর কোন চিহ্ন না রাখার জন্য দেহাবশেষ পুড়িয়ে কামানের গোলায় ভরে সেই ছাই দূরে নিক্ষেপ করা হয়।

কাছাকাছি সময়ে কিং সাম্রাজ্য চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও অনেকগুলো বিদ্রোহের সম্মুখিন হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: পান্টি-হাক্কা গোত্র যুদ্ধ (১৮৫৫-৬৭), নিয়ান বিদ্রোহ (১৮৫১-৬৮), মিয়াও বিদ্রোহ (১৮৫৪-৭৩), পান্থে বিদ্রোহ (১৮৫৬-৭৩), ডুংগান বিদ্রোহ (১৮৬২-৭৭)। এসবের রেশ থাকতে থাকতেই উত্তর চীনে ১৮৭৬-৭৯ সময়কালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যাতে প্রায় ৯০ লাখ থেকে দেড় কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করেন বলে ধারণা করা হয়। ১৮৯৮ সালে তৎকালীন সম্রাট সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কারের উদ্যোগ নিলেও তা কার্যকর হয়নি। শতকের শেষ বছরে চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদেশি শক্তির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এবং তা গণঅভ্যুত্থানের রূপ নেয়। ১৮৯৯ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত সংঘটিত এই বিদ্রোহ 'বক্সার বিদ্রোহ' নামে পরিচিত হয়।

বস্তুত প্রথম ও দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধে চীনের পরাজয়ের পর সেখানে ইউরোপীয় শক্তির প্রভাব অনেক বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়ী ও সেনাবাহিনীর ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ছাড়াও বৃদ্ধি পায় তাদের সাথে সম্পর্কিত খ্রীষ্টান মিশনারীর সংখ্যাও। বক্সার বিদ্রোহের পেছনে ছিলো জনগণের মধ্যে সৃষ্ট ব্যাপক ক্ষোভ যার পেছনে দুটো কারণ প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। এর একটি হলো বিস্তৃত খরায় মানুষের দুর্ভোগ এবং দ্বিতীয় ছিলো বিদেশিদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব, যাকে নিজেদের সমস্যা সমাধানের পথে বাধা হিসেবে দেখেছেন চীনের মানুষেরা। এই বিদ্রোহে সম্রাটের প্রভাবাধীন বিভিন্ন গোষ্ঠীর একাংশও যোগ দেয়। কারণ তাদের ভয় ছিলো ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির আধিপত্য চীনে ভারতের পরিণতি নিয়ে আসবে।

বক্সার বিদ্রোহে প্রধানত তরুণেরাই অংশ নেয়। কোন কোন অঞ্চলে এটি খ্রীষ্টান জনগোষ্ঠীর ওপর সাম্প্রদায়িক হামলারও রূপ নেয়। বিদ্রোহী বাহিনীতে নারীর অংশগ্রহণ অনুমোদিত ছিলো না। সেজন্য গড়ে ওঠে ভিন্ন নারী বাহিনী। বিদ্রোহীদের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতিতে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সম্রাটের বাহিনী বক্সার বিদ্রোহীদের নির্মমভাবে দমন করে। সরকারের মধ্যে থেকে যেসব ব্যক্তি এই বিদ্রোহের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শেষ পর্যন্ত তাতে কোনো কাজ হয়নি।

বিদ্রোহ ও জনবিক্ষোভই এক দশকের মাথায় সম্রাটের শাসনের অবসান ঘটায় এবং ২০ শতকের প্রথম দিকে চীনা প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে।

উনিশ শতকের চীন: বিশ্ব বাণিজ্য

চীনের সম্পদ, ঐশ্বর্য এবং প্রযুক্তি নিয়ে ইউরোপের আগ্রহ বহু পুরনো। আগেও কেউ কেউ ইউরোপ থেকে চীন সফর করেছেন, তবে ত্রয়োদশ শতকে ইটালীর মার্কোপোলোর সফরেরই প্রথম বিস্তৃত প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায়। কারণ কুবলাই খানের শাসনাধীন চীন থেকে ২৩ বছর পর দেশে ফিরে মার্কোপোলো তাঁর সফর নিয়ে বিস্তারিত লিখেছিলেন। তৎকালীন ইউরোপ তাঁর কাছ থেকে চীনের সমৃদ্ধি সম্পর্কে জেনে মোহিত হয়েছিলো। তবে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেবার মতো অবস্থা তাদের তখনও তৈরি হয়নি। সেই সক্ষমতা ইউরোপ অর্জন করে কেবল শিল্প বিপ্লব শুরুর পরই।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে চীনের চা বহির্বিশ্বে আমদানি শুরু করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই বৃটেন ও আমেরিকায় এই চা এর চাহিদা এতো বেড়ে যায় যে, এটাই হয়ে দাঁড়ায় এই কোম্পানির মুনাফার প্রধান উৎস। এর ওপর আরোপিত শুল্ক থেকেই তখন বৃটেনের মোট রাজস্বের এক দশমাংশ আয় হতো। এর সাথে চীনা সিল্ক, চীনামাটির বাসনকোসনসহ আরও বেশ কিছু দ্রব্য তালিকায় নিয়ে পরিষ্কার দেখা যায় যে, তখন ইউরোপ ও আমেরিকায় চীনা দ্রব্যের চাহিদা ছিলো লাভজনক বিশ্ব বাণিজ্যের অন্যতম অবলম্বন। কিন্তু বিশ্ববাণিজ্যের এই অবস্থা ছিলো খুবই ভারসাম্যহীন। কেননা ইউরোপ আমেরিকায় চীনা দ্রব্যের চাহিদা বাড়তে থাকলেও তখন চীনে ইউরোপ আমেরিকার পণ্যের চাহিদা তৈরি হয়নি, চীনা বাজারে ইউরোপ আমেরিকার কোনো পণ্যই আগ্রহ তৈরি করতে পারেনি। চীনাদের ভাষ্য ছিলো, খাদ্য, পোশাক আশাকসহ সকল ক্ষেত্রেই চীনের দ্রব্য উন্নততর। সুতরাং তাদের কোনোকিছুই আমদানি করবার দরকার নেই।

বৃটেন ও আমেরিকায় এই চা এর চাহিদা এতো বেড়ে যায় যে, এটাই হয়ে দাঁড়ায় এই কোম্পানির মুনাফার প্রধান উৎস। এর ওপর আরোপিত শুল্ক থেকেই তখন বৃটেনের মোট রাজস্বের এক দশমাংশ আয় হতো।

চীন ও বিশ্ব বাণিজ্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে ইকোনমিস্ট পত্রিকা সম্প্রতি লিখেছে, অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই বৃটিশ শিল্পপতিরা বহির্বিশ্বে তাদের পণ্যের বাজার খুঁজতে চেষ্টা শুরু করে। জনসংখ্যার কারণে চীন ছিলো তাদের হিসাবে একটা বিশাল সম্ভাবনা, কিন্তু এশিয়া আফ্রিকার আর বহু অঞ্চলের মতো চীন উপনিবেশ ছিলো না। সেজন্য তাদের চেষ্টা শুরু হয় বাণিজ্যিক মিশন দিয়ে। ইকোনমিস্ট আরও লিখেছে, এ ব্যাপারে ব্রিটিশ রাজার সমর্থন নিয়ে একটি বাণিজ্যিক মিশনের প্রধান হিসেবে জন ম্যাকার্টন চীন সফর করেন অষ্টাদশ শতকের শেষে। বৃটিশ শিল্পের সবচাইতে উৎকৃষ্ট পণ্য সম্ভার নিয়ে তিনি সাক্ষাৎ করেন চীনের তৎকালীন সম্রাটের সাথে। রাজা জর্জের নামে তিনি এগুলো উপহার সামগ্রী হিসেবে সম্রাটকে প্রদান করেন এবং এসব পণ্যের জন্য চীনের বাজার খুলে দেবার অনুরোধ জানান। কিন্তু জবাবে চীনের সম্রাট জানান, 'জিনিষগুলো ভালোই, কিন্তু এর কোনোটিই চীনের প্রয়োজন নেই। চীনে সবকিছুই এর থেকে উৎকৃষ্টমানের'।[৩]

3. http://www.economist.com/news/essays/21609649-china-becomes-again-worlds-largest-economy-it-wants-respect-it-enjoyed-centuries-past-it-does-not

চীনে তখন বৃটিশদের বাণিজ্যের জন্য একটি বন্দরই খোলা ছিলো, জোয়ানজো যা ক্যান্টন নামেও পরিচিত। কিন্তু আর কোনো বন্দরের অনুমতি পাওয়া যায় নি। পণ্যের বাজারেরও কোন নিশ্চয়তা মেলে নি। এর ফলে বাণিজ্য সম্প্রসারিত হতে থাকলো ঠিকই, কিন্তু তা থেকে গেলো প্রায় একমুখি, ফলে ক্রমবর্ধমান হারে তা হতে থাকলো অসম। এর ফলে বৃটেনের মুদ্রা বিশেষত স্বর্ণ ও রূপা গিয়ে জমতে থাকলো চীনে। কিন্তু এর বিপরীত স্রোত সৃষ্টি করা হয়ে দাঁড়ালো দুষ্কর। তখনই বৃটিশ বণিকেরা আফিমের মধ্যে দেখলো তাদের সংকট থেকে বের হবার একমাত্র পথ, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। তাই চীনে তার রফতানি চেষ্টায় বহুমুখি তৎপরতা শুরু হলো।

আগেই বলেছি, চীনে এই আফিমের বাজার তৈরিও সহজ ছিলো না। চীন রাজি ছিলো না, তাদের রাজি করাতে বৃটিশদের যুদ্ধ করতে হলো। এই যুদ্ধে চীনের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে চীনের বাজার উন্মুক্ত হলো আফিমের জন্য। শুধু তাই নয়, পরাজয়ের পর জরিমানা হিসেবে হংকং চলে গেলো বৃটিশদের হাতে। আর তার সাথে শুরু হলো চীনের অপমানের আরও অধ্যায়। এর আগেই ম্যাকাও পর্তুগীজরা দখলে নিয়ে নিয়েছিলো। চীনে একের পর এক ইউরোপীয় কোম্পানির আধিপত্য বৃদ্ধি পেতে থাকলো। মার্কিনীরাও ছিলো পেছনে। উনিশ শতকের শেষে এসে জাপানের কাছে তার পরাজয় ছিলো আরও বড় আঘাত। শুধু সামরিক নয়, সাংস্কৃতিকও; কেননা চীনারা বিশ্বাস করতো চীনের সংস্কৃতি দর্শন নিয়েই গড়ে উঠেছে জাপান। কিন্তু ১৮৬৮ সালে মেইজি পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে জাপান তখন ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের মতো ঘটনা ঘটাচ্ছে, এগিয়ে গেছে চীনের তুলনায়। সেইকারণে ইউরোপের মতো জাপানও নিজ উন্নয়নের চাপেই নতুন নতুন সম্পদ ও বাজার দখলে আগ্রাসী।

এর ফলে বাণিজ্য সম্প্রসারিত হতে থাকলো ঠিকই, কিন্তু তা থেকে গেলো প্রায় একমুখি, ফলে ক্রমবর্ধমান হারে তা হতে থাকলো অসম। এর ফলে বৃটেনের মুদ্রা বিশেষত স্বর্ণ ও রূপা গিয়ে জমতে থাকলো চীনে। কিন্তু এর বিপরীত স্রোত সৃষ্টি করা হয়ে দাঁড়ালো দুষ্কর। তখনই বৃটিশ বণিকেরা আফিমের মধ্যে দেখলো তাদের সংকট থেকে বের হবার একমাত্র পথ, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৯ সালের বিপ্লব ছিলো চীনকে শতবর্ষের অপমানের ভার থেকে মুক্ত করবার সামাজিক তাগিদের এক শক্তিশালী বহিপ্রকাশ। কিন্তু এর ক্ষেত্র তৈরিতে বিশ শতকের শুরু থেকেই নানা পরিবর্তন ভূমিকা পালন করে।

সানইয়াৎ সেন এবং প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাব

চীনে সম্রাটের শাসন বা রাজতন্ত্রের ব্যবস্থা নানা আভ্যন্তরীণ সংকটে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে উনিশ শতকের মধ্যেই। একদিকে বিদেশি আগ্রাসন এবং অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ জনবিদ্রোহ এই সংকট বৃদ্ধি করে এবং এর পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। অনেক ঘটনাবলী, লড়াই ও রক্তপাতের পর বিশ শতকের শুরুতেই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। চীন প্রবেশ করে প্রজাতন্ত্রের পর্বে। প্রজাতন্ত্র হিসেবে চীনকে পুনর্গঠন করা সহজসাধ্য বা শান্তিপূর্ণ ছিলো না। কিন্তু এই পর্ব ছিলো ভবিষ্যতের আরও বড় পরিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

চীনের প্রজাতন্ত্র হিসেবে আবির্ভাবের সঙ্গে যার নাম সবচাইতে বেশি শোনা যায় তিনি ডা. সান ইয়াৎ সেন (১২ নভেম্বর ১৮৬৬- ১২ মার্চ ১৯২৫)। চীনের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পথিকৃৎ হিসেবে তিনি স্বীকৃত। তাঁকে ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তিনি চীন প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। 'বিপ্লবী ঐক্য' নামের একটি মঞ্চ থেকেই কিং সাম্রাজ্য পতনের আন্দোলন পরিচালিত হয়। পরে এই মঞ্চের ধারাবাহিকতা থেকেই কুওমিংটান নামে রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। সান ইয়াৎ সেন এরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের মূল ভিত্তি ছিলো তিনটি: জাতীয়তাবাদ (minzu), গণতন্ত্র (minquan) ও জনকল্যাণ (minsheng)। সান-এর জীবন ছিলো খুবই সংঘাতময়, বহুবার তাঁকে নির্বাসনে যেতে হয়েছে। প্রেসিডেন্ট হবার পরও তাঁর জীবন সংঘাতমুক্ত হয়নি।

উনিশ শতকের শেষ দিকে কিং সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি বিদ্রোহের কালে সান ইয়াৎ সেন হংকং এ চিকিৎসা শাস্ত্রের ছাত্র ছিলেন। তবে একইসঙ্গে তিনি চীনের ভেতর ও বাইরে নানা সংগঠনের মাধ্যমে তৎপর ছিলেন, ডাক্তার হিসেবে তাঁর কর্মজীবন স্থগিত করেই চীনকে বদলানোর রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে যোগ দেন। বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে বহুমুখি তৎপরতার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। অনেকগুলো গ্রুপ তৈরি হয়েছিলো তখন। কেউ কেউ সম্রাট শাসনের সংস্কার শক্তিশালীকরণের পক্ষে ছিলেন, কেউ কেউ এর পরিবর্তনের নানা মডেল নিয়ে কথা বলছিলেন। অভ্যুত্থান, ক্ষমতাদখলের তৎপরতাও ছিলো। এসবের সাথে যুক্ত থাকার দায়েই সানকে বেশ কয়েকবার নির্বাসনে যেতে হয়েছিলো। সানইয়াৎ সেন-এর রাজনৈতিক তৎপরতায় প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁর হাউয়াই প্রবাসী ভাই। এখানেই সান তাঁর 'রিভাইভ চায়না সোসাইটি' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীতে সান এর ভাই তাঁর ১২ হাজার একর খামারের জমি ও গবাদিপশুর বড় অংশ বিক্রি করে সান-এর বিপ্লবী তৎপরতায় অর্থযোগান দেন।

উনিশ শতকের শেষে ফিলিপাইনে বিপ্লবী সংগ্রাম বিস্তার লাভ করে, মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিপাইনের যুদ্ধও সেই সময়ের ঘটনা। সান এর সাথে ফিলিপিনো বিপ্লবীদের যোগাযোগ আদান প্রদান শুরু হয়। সান এর ধারণা ছিলো ফিলিপাইনে স্বাধীনতা সংগ্রাম বিজয়ী হলে চীনে বিপ্লবী আন্দোলন অনেকগুলো অনুকূল উপাদান পেয়ে আরও গতিপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু ১৯০২ সালে যুক্তরাষ্ট্র বিজয়ী হিসেবে ফিলিপাইনে তার দখল নিশ্চিত করে।

বস্তুত সান ইয়াৎ সেন-এর বেশ কয়েকটি অভ্যুত্থান পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। সেজন্য তাঁকে বারবারই নির্বাসনে যেতে হয়। শুধু জাপান নয়, নির্বাসনে তাঁকে যেতে হয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাতেও। এসব স্থানে তিনি প্রবাসী চীনা ও সে দেশীদের মধ্যে নতুন চীন নিয়ে জনমত তৈরি করেছেন, তহবিল সংগ্রহ করেছেন। তবে বিভিন্ন স্থানে চীনের রাজকীয় গোয়েন্দা সংস্থার হয়রানির শিকারও হয়েছেন তিনি। আটক হয়েছেন, হত্যার চেষ্টাও হয়েছিলো।

১৯০৫ সালে টোকিওতে তিনি চীনা ছাত্রদের বিপ্লবী গ্রুপে যোগদান করেন। মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে প্রবাসী চীনাদের মধ্যেও তখন এই ধরনের পরিবর্তনকামী চিন্তার বিস্তার ঘটছিলো দ্রুত। সেকারণে সান-এর সাথেও তাঁদের ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। এসব অঞ্চলে অনেকগুলো পাঠচক্রের মাধ্যমে নতুন চিন্তার বিকাশ ও বিস্তার ঘটতে থাকে। ১৯০৭-৮ এ বেশ কয়েকটি অভ্যুত্থান চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এসব ব্যর্থতার কারণে সানবিরোধী বেশ কয়েকটি গ্রুপও তৈরি হয়, সানপন্থী ও সানবিরোধী এই দুই গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায় বিপ্লবী গ্রুপগুলো।

১৯১১ সালের ২৭ এপ্রিল আরেকটি ব্যর্থ অভ্যুত্থান হয়, শহীদ হন

অনেকে। কিন্তু একই বছরের ১০ অক্টোবর হুয়াং জিং এর নেতৃত্বে সফল সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে যা দুই হাজার বছরের সাম্রাজ্যিক শাসনের অবসান ঘটায়। কিন্তু এতে সান ইয়াৎ সেন সরাসরি যুক্ত ছিলেন না, তিনি তখন যুক্তরাষ্ট্র সফর করছিলেন, সেখান থেকে ফিরে আসেন এর পরপরই। ১৯১১ সালের ২৯ ডিসেম্বর বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে নানকিংএ সর্বদলীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সানইয়াৎ সেন কে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট লি ইওয়ান হং ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং হুয়াং জিংকে সামরিক বিষয়ক মন্ত্রী নির্বাচন করা হয়। চীন প্রজাতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয় ১৯১২ সালের ১ জানুয়ারি।

৪ঠা মে আন্দোলন

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব বিশ্বের অন্য অঞ্চলগুলোর মতো চীনকেও নানাভাবে প্রভাবিত করেছিলো। তরুণদের চিন্তা ও সংগঠনে এর প্রভাব পড়ে প্রথম। ১৯১৯ সালের মে মাসে প্রধানত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে চীনের বিভিন্ন শহরে যে আন্দোলন সংঘটিত হয় তার উদ্যোক্তা হিসেবে এই তরুণদের ভূমিকা ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। এটি '৪ঠা মে আন্দোলন' নামে পরে পরিচিতি পায় কেননা এইদিনই আন্দোলন বিস্তৃত হয়েছিলো। এই আন্দোলন প্রাথমিকভাবে গড়ে ওঠেছিলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী 'ভার্সাই চুক্তি' নিয়ে চীন সরকারের দুর্বল অবস্থানের প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। চীন এই বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো 'মিত্রশক্তি'র পক্ষে এই শর্তে যে, জার্মানী চীনের যে অঞ্চল আগে থেকে দখল করে রেখেছিলো তা চীনকে ফেরত দেয়া হবে। উল্লেখ্য যে, এই যুদ্ধে চীনের প্রায় দেড় লক্ষ সৈনিক ও শ্রমিক ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অংশ হিসেবে কাজ করে।

কিন্তু ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে তৈরি 'ভার্সাই চুক্তিনামা'য় চীনের উপরোক্ত শর্ত রক্ষা করা হয়নি। বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানীর নিয়ন্ত্রণ থেকে চীনের শানডং এলাকা মুক্ত হয়, কিন্তু এর ওপর জাপানের দখলের বৈধতা দেয়া হয়। সরকারও এর বিরুদ্ধে কোন দৃঢ় অবস্থান নিতে ব্যর্থ হয়। জনগণের ক্ষোভ দ্রুত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের রূপ নেয়। চীনের ভূখন্ড, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্যমান ক্ষোভই শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় চেতনার নতুন সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। যে কারণে একে 'নয়া সংস্কৃতি আন্দোলন'ও বলা হয়। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তরুণদের অনেকেই পরবর্তী সময়ের বিপ্লবী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ভার্সাই চুক্তি নিয়ে আলোচনার সময় চীনা সরকার অংশীদার অন্যান্য দেশের কাছে তিনটি আবেদন উপস্থিত করেছিলো। এগুলো হল: (১) চীনে সকল বিদেশি শক্তির বিশেষ সুবিধার অবসান। (২) চীনের ওপর জাপানীদের দাবি প্রত্যাখ্যান। (৩) জার্মানীর হাত থেকে মুক্ত চীনা অঞ্চল জাপানী দখলমুক্ত করা। ভার্সাই সভায় উপস্থিত বিজয়ী পশ্চিমা শক্তিগুলোর কাছে চীনের এসব দাবির কোন গুরুত্বই ছিলো না। চীনকে উপেক্ষা করেই ১৯১৯ সালের ২৮ জুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে যায়।

যাই হোক চুক্তি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে মে মাসের ৪ তারিখ সকালে বেইজিংএর তেরোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ৫টি প্রস্তাব নিয়ে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি নিতে একমত হন। এই প্রস্তাবগুলো হলো: (১) চীনা ভূমির ওপর জাপানী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান। (২) চীনের করুণ অসম্মানজনক পরিস্থিতি দেশের জনগণের কাছে তুলে ধরা। (৩) বেইজিংএ একটি বিশাল সমাবেশের ব্যাপারে জনমত তৈরি করা। (৪) বেইজিং স্টুডেন্ট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা। এবং (৫) বিকালে সম্মিলিত সমাবেশ করা।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এইদিন বিকালে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল করে এসে তিয়েনআনমেন এর সামনে সমাবেশ করে। 'মিত্রশক্তি'র বিশ্বাসঘাতকতা এবং সরকারের দুর্বল ভূমিকার সমালোচনার পাশাপাশি সমাবেশ থেকে জাপানী পণ্য বয়কট এবং 'জাপানের দালাল'দের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানানো হয়। জাপানের দালাল বলে পরিচিত এরকম এক সরকারি কর্মকর্তার বাড়িতে হামলার পর শিক্ষার্থীরা ব্যাপক নির্যাতনের শিকার হয়। অনেককে গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদে পরের দিন বেইজিং এর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। তেরোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলররা ছাত্রবন্দীদের মুক্ত করতে নানা উদ্যোগ নেন, পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান এই ছাত্র নির্যাতনের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। সংবাদপত্র, বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন, চেম্বার অব কমার্স শিক্ষার্থীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে। শিক্ষার্থীদের সাথে যোগ দেয় বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যবসায়ী ও শ্রমিকেরাও। খবর ছড়িয়ে যায় অন্যান্য শহরে। জুনের প্রথম দিকে সাংহাই এর শিক্ষার্থী, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরাও আন্দোলনে যোগ দেয়। এই সময় থেকে আন্দোলনের কেন্দ্র কার্যত সাংহাইতে স্থানান্তরিত হয়।

মে মাসের ৪ তারিখ সকালে বেইজিংএর তেরোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ৫টি প্রস্তাব নিয়ে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি নিতে একমত হন। এই প্রস্তাবগুলো হলো: (১) চীনা ভূমির ওপর জাপানী নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান। (২) চীনের করুণ অসম্মানজনক পরিস্থিতি দেশের জনগণের কাছে তুলে ধরা। (৩) বেইজিং এ একটি বিশাল সমাবেশের ব্যাপারে জনমত তৈরি করা। (৪) বেইজিং স্টুডেন্ট ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা। এবং (৫) বিকালে সম্মিলিত সমাবেশ করা।

এক পর্যায়ে ব্যবসায়ীরা সরকারের ভূমিকার পরিবর্তন না হলে কর দেয়া বন্ধ করে দেবার হুমকি দেয়। সাংহাইতে ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের ধর্মঘট অর্থনীতিতে অচলাবস্থা তৈরি করে। ক্রমবিস্তৃত প্রতিরোধের মুখে সরকার আটক ছাত্রদের মুক্তি দেয় এবং অভিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের চাকুরিচ্যুত করে। প্যারিসে চীন সরকারের প্রতিনিধিরা ভার্সাই চুক্তি সই করতে অস্বীকৃতি জানায়। যদিও জাপান চীনাভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখে তবুও এই খন্ড সাফল্য চীনের মানুষের বিভিন্ন অংশের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের শক্তি সম্পর্কে জানান দেয়। এই আন্দোলন সমাজের চিন্তার বিপ্লবীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যা কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।

চিয়াং কাই শেক ৪ঠা মে আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন। ডা. সান ইয়াৎ সেনও 'তরুণদের বিভ্রান্ত করবার' অভিযোগ তুলে এই সময়ের কোন কোন বুদ্ধিজীবীর সমালোচনা করেন। চীনের প্রাচীন মূল্যবোধ, সংস্কৃতির সঙ্গে পশ্চিমের সংস্কৃতির সম্পর্ক/বিরোধ নিয়ে সমাজে একধরনের উদ্বেগ ছিলো তখন। তরুণদের প্রথা ভাঙার প্রবণতায় অনেকেই আতংকিত হন। কিন্তু ২০ বছর পর ৪ঠা মে আন্দোলন মূল্যায়ন করতে গিয়ে মাও জে দং (মাও সে তুং) বলেন, এই

আন্দোলন 'সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদের বিরুদ্ধে চীনের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এক নতুন পর্ব রচনা করেছিলো। এর মধ্যে দিয়ে যে সাংস্কৃতিক সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিলো তা এর একটি দিক মাত্র। সেসময়ে নতুন সামাজিক শক্তির বিকাশ ও বিস্তারের কালে শ্রমিক শ্রেণী, শিক্ষার্থী এবং নতুন জাতীয় বুর্জোয়ার ঐক্যবদ্ধ শক্তিই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে হাজির হয়েছিলো। লাখ লাখ শিক্ষার্থী সাহসের সঙ্গে অংশ নিয়েছিলো এই সংগ্রামে। এটি ১৯১১ এর বিপ্লবকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো।'[৪]

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সূচনাকাল

উনিশ শতকের শুরুতেই ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ন চীন সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ জানিয়েছিলেন এভাবে, 'চীনের ঘুমিয়ে থাকাই ভালো। কারণ এই দেশ জেগে উঠলে সারা দুনিয়া তোলপাড় করবে।' বস্তুত বিশ শতকের শুরু থেকেই নতুন ভাবে চীনের বিশাল জনগোষ্ঠীর 'জেগে উঠা'র বিভিন্ন ধাপ তৈরি হয়। কৃষিপ্রধান বিস্তীর্ণ একটি অঞ্চলে, যার বহু এলাকা দুর্গম, একদিকে সামন্ত প্রভু অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন শক্তির ক্রমবর্ধমান দাপটের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন এবং তার দ্রুত বিকাশ বিস্ময়কর মনে হবেই। এই পার্টির যথাযথ ভূমিকার কারণে দ্রুতগতিতে চীনের রাজনৈতিক মানচিত্রে বিপ্লবী শক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে।

১৯২০ এর দিকে চীন ও চীনের বাইরে সমাজতন্ত্রী চিন্তা নিয়ে অনেকগুলো সক্রিয় গ্রুপের কার্যক্রম দেখা যায়। এরকম অনেকগুলো গ্রুপের প্রথম সম্মিলিত কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালের জুলাই মাসে। পার্টি গঠনে এই উদ্যোগের পেছনে তৃতীয় আন্তর্জাতিক (১৯১৯-১৯৪৩) বা কমিনটার্ণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন যেসব গ্রুপ, তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন: পিকিং এ লি তা-চাও, ক্যান্টনে চেন তু-সিউ, হুনানে মাও, শানতুঙ এ হুপেই। সাংহাইতে এই কংগ্রেস শুরু হয়, এটি স্থানান্তরিত হয় জিয়াক্সিন-এর সাউথ লেক-এ। নিরাপদ স্থান না পাওয়ায় লেকের ওপর ভাসমান নৌকাতেই কংগ্রেসের সফল সমাপ্তি ঘটে। সকল গ্রুপের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে সম্মিলিত সিদ্ধান্তে জন্ম নেয় চীন কমিউনিস্ট পার্টি।

মাও সে তুং (১৮৯৩-১৯৭৬) এর সাথে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক তাই প্রথম থেকেই। তাঁর কৈশোর ও বেড়ে ওঠার কাল ছিলো চীনের নতুন চিন্তা ও সংগঠনের অভ্যুদয়কাল। ১৯১১ সালে চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে ও পরে বিভিন্ন অঞ্চলে শোষণ, নির্যাতন, প্রতিরোধ, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ত প্রভু বিরোধী লড়াইএর ঘটনাপ্রবাহ এবং সমাজে চিন্তাভাবনার গতি খুব দ্রুত মাওকে পরিণত চিন্তা ও সক্রিয় সাংগঠনিক ব্যক্তিত্বে উন্নীত করে। মুক্তির চিন্তা ও মুক্তির লড়াইয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালনের আগ্রহই তাঁর জীবনের গতি নির্ধারণ করে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর সীমিতই ছিলো। বস্তুত স্বশিক্ষাই তাঁকে তৈরি করেছে। লাইব্রেরীতে নিয়মিত যাতায়াত ও পড়াশোনা, সহকারী লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কাজ করা এবং বিদ্যাজগতে নতুন নতুন চিন্তার সাথে পরিচয় তাঁর জীবনের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মার্কসীয় সাহিত্যের সাথে তাঁর পরিচয় ১৯২০ সালে। তার আগেই তিনি কৃষক, ছাত্র ও শ্রমিক আন্দোলনের কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। লাইব্রেরীতেই তাঁর যোগাযোগ হয় কমিউনিস্ট চিন্তা নিয়ে সক্রিয় ব্যক্তিবর্গের সাথে, যারা তখন বিভিন্ন পাঠচক্র ও গ্রুপের মাধ্যমে কাজ করতেন। 'সমাজতান্ত্রিক যুব বাহিনী' নামে একটি সংগঠনের হুনান শাখা সংগঠিত করেন মাও ১৯২০ সালে। সেসময় তাঁর সাথে ছিলেন লিউ শাও চী। ১৯২১ সাল থেকে শুরু হয় তাঁর পার্টি কার্যক্রম।

কমিনটার্ণের তত্ত্বাবধানে পার্টি লেনিনীয় ধারায় পুনর্গঠিত হয় ১৯২৩ সালে। তবে বিভিন্ন কারণে কমিনটার্ণের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই পার্টি সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা ছিলো না। এদিকে প্রতিষ্ঠাকালের কিছু পরেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে কর্মকৌশল নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। কমিনটার্ণের তদারকী ও তার ওপর নির্ভরশীলতা নিয়েও জটিলতা সৃষ্টি হয়। এর আগের বছর ১৯২২ সালে জরুরীভাবে আহুত কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে প্রস্তাব তোলা হয় যে, পার্টি সদস্যরা জাতীয়তাবাদী কুওমিনটাং পার্টিতে যোগদান করুক। কেননা এটি জনগণের মধ্যে অনেক বেশি বিস্তৃত, জনপ্রিয়। ভেতর থেকে একে পরিবর্তিত করা সহজ হবে। এই একই লাইন আমাদের অঞ্চলেও আমরা দেখেছি, দেখেছি তার পরিণতিও। এই লাইনেই অনেকে ভারতের কংগ্রেসে, পূর্ব বাঙলায় আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে কাজ করেছেন। প্রায় সকলেই এই কৌশলগত কাজ করতে করতে নিজেরাই দ্রবীভূত হয়েছেন।

তবে চীনে শুরু একইরকম হলেও পরে পার্থক্য তৈরি হয়েছে। চীনে পার্টির মধ্যে এই বিতর্কে তিনটি ধারা ছিলো। একটির মত ছিলো কুওমিনটাং পার্টির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা যাবে না, কোন যুক্তফ্রন্ট করা যাবে না। আরেকটি ধারার মত ছিলো, এই কুওমিনটাং পার্টির সাথে মিশে যেতে হবে। তৃতীয় মতটিই গৃহীত হয় যেখানে বলা হয়, নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্ব ও পরিচয় নিয়ে ঐ পার্টিতে কমিউনিস্টরা কাজ করবে এবং নিজ শর্ত অনুযায়ী যুক্তফ্রন্ট গঠন করবে।

এই ঐক্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কুওমিনটাং পার্টিও কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত নিয়েই কমিউনিস্টদের সাথে কাজ করেছে। এই পার্টির মধ্যেও কমিউনিস্টদের সাথে কাজ করবার ব্যাপারে ভিন্নমত ছিলো। সান ইয়াৎ সেন এই ঐক্যের বিষয়ে বরাবর আগ্রহী ছিলেন, তিনি কমিউনিস্টদের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল ছিলেন, নির্ভরযোগ্য মিত্র মনে করতেন। কমিউনিস্টদের একইসঙ্গে দুই পার্টির সদস্যপদ রক্ষার ব্যাপারে তাঁর কোন আপত্তি ছিলো না। অনেকে সেভাবে ছিলেনও। লুকোচুরি, পরিচয় গোপন রাখার কোন ব্যাপার ছিলো না। ১৯২৫ সালে সান মৃত্যুবরণ করবার পর কমিউনিস্ট বিদ্বেষীদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এই কমিউনিস্ট বিরোধীদের মধ্যে সবচাইতে সরব ছিলেন চিয়াং কাই শেক।

আভ্যন্তরীণ বিরোধ সত্ত্বেও কুওমিনটাং ও কমিউনিস্ট পার্টির যুক্তফ্রন্ট নেতৃত্ব সফলভাবে উত্তর অভিযান সম্পন্ন করে এবং বেশ কিছু অঞ্চল সমরপ্রভুদের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে। এই অভিযান সমাপ্তির পরই দুই পার্টির মধ্যে বিরোধ তীব্র হয়। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি নিজ স্বাতন্ত্র্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে দৃঢ় থাকায় কুওমিনটাং পার্টির সাথে সম্পর্কে ওঠানামা হয়েছে, বৈরী অবস্থানও তৈরি হয়েছে তবে ঠিকই বিকশিত হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি। এর মধ্যে চীন কমিউনিস্ট পার্টি বেশ কয়েকটি মুক্ত অঞ্চল গঠন করতে সক্ষম হয় যেগুলোকে তারা অভিহিত করতো 'সোভিয়েত অঞ্চল' বলে। এর মধ্যে বৃহত্তম অঞ্চলটির নেতৃত্বে ছিলেন মাও সে তুং ও চু তে। ...(চলবে)

আনু মুহাম্মদ: লেখক, শিক্ষক। অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: anu@juniv.edu

4. Mao Tse Tung: May 4th Movement, May 1939, Selected Works, Volume 2, https://www.marxists.org/reference/archive/mao selected-works/volume-2/mswv2_13.htm